অজয় রায়

বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজনির্মাণ

এক. বিজ্ঞানের পথ

কথা উঠেছে বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে 'বিটিভি'র একটি অনুষ্ঠানে উপস্থাপক জোরে শোরে অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনায় উচ্চারণ করেন—তাঁর অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল একটি বিজ্ঞানমনস্ক ও ধর্মনিষ্ঠ সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করা। সদ্‌উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে। আমাদের রাজনীতিবিদরাও অহরহ আপ্তবাক্যের মতো উপদেশবাণী বিকিরণ করছেন আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হবার জন্য, অঙ্গীকার করছেন বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৈরির। বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ চাই, চাই বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা, চাই বৈজ্ঞানিক পন্থায় দেশের সকল সমস্যার সামাধান, তা সে অর্থনৈতিক সমস্যাই হোক আর সামাজিক সমস্যাই হোক।

কিন্তু 'বিজ্ঞানমনস্কতা', 'বিজ্ঞানচেতনা', 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি'—এসব শব্দ উচ্চারণ করে আমরা ঠিক কি বোঝাতে চাই, আমরা ঠিক কি চাই তা উপদেশ প্রদানকারীরা আমাদের মতো অজ্ঞ প্রাকৃতজনার কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরেন না, বিষয়টিকে পরিস্ফুট করেন না। বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ কি ধরনের হবে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, স্পষ্ট নয় বৈজ্ঞানিক পন্থায় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারটিও। আসলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি কি ধরনের পদ্ধতি তা কি আমাদের জানা আছে? কিভাবে অগ্রসর হলে বিজ্ঞানসিদ্ধ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হওয়া যায় তা কি আমাদের শেখান হয় আমাদের জীবনচর্চায়, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে, আমাদের পাঠ্যক্রমে, অথবা স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচিতে কি তা প্রতিফলিত? এসব প্রশ্ন অবশ্য তোলা যায়।

'বিজ্ঞান' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'বিশেষ জ্ঞান'। কিন্তু ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক 'বিজ্ঞান' শব্দটি আমরা Science-এর প্রতিশব্দ হিসেবে চিহ্নিত করেছি। আর Science হল একটি পথ ও প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করি, জ্ঞান সৃষ্টি করি—সত্যে উপনীত হতে পারি। বিজ্ঞানের ভিত্ হল যুক্তি, যুক্তিসিদ্ধ চিন্তা আর নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ। কাজেই বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়তে হলে—এই কারিগরকে করতে হবে বিজ্ঞানচর্চা।

বিজ্ঞানচর্চার যে দুটি দিক আছে আমরা প্রায়শ তা ভুলে যাই। এর প্রায়োগিক দিকটি সম্পর্কে আমরা অবশ্য সচেতন, কারণ তা আমাদের বস্তুজীবনকে প্রভাবিত করে, আয়েশ

এনে দেয়। অন্যদিকটি হল এর দর্শন, যা আমাদের চিন্তা ও চেতনাকে স্বচ্ছ করে তুলতে সহায়ক, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হয় যুক্তিনির্ভর—গণিতের মতো প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট। বিজ্ঞানের এই দর্শনের কথা আমাদের মনে থাকে না। অনেকের ধারণা বিজ্ঞান নিখুঁত জ্ঞান দানে সমর্থ। এটি কিন্তু এক অর্থে ঠিক নয়। কারণ জ্ঞানের শেষ নেই; বিজ্ঞানচর্চা এই জ্ঞানের দিগন্তকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে এক ধাপ থেকে উন্নততর ধাপে উন্নীত করে এই প্রক্রিয়া অবিরত ধারায় চলতে থাকে। বৈজ্ঞানিক পন্থার সার কথা হল : পর্যবেক্ষণ থেকে বা তত্ত্ব থেকে অনুমান বা অনুসিদ্ধান্ত নির্মিত হয়, এবং পরীক্ষাগারে বা পর্যবেক্ষণমূলক নিরীক্ষার সাহায্যে এসব অনুসিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়। প্রতিটি নিরীক্ষা সম্পর্কে মীমাংসা হওয়ার পর স্থির করা হয় অনুসিদ্ধান্তটি সমর্থিত হল, না বাতিল হল। তারপর প্রথম অনুমানের পরীক্ষার জন্য সংগৃহীত উপাত্ত নতুন সব অনুমানের উদ্ভাবনে ব্যবহৃত হয়, এই সব নতুন অনুমান আবার আরো সব উত্তরের, সেই সঙ্গে আরো সব প্রশ্নের জন্ম দেয়। অর্থাৎ আমরা যত জানতে পারি, তত জানতে পারি আমরা কী জানি না। যদি নিখুঁত জ্ঞান (পরিশুদ্ধ জ্ঞান) বলতে বোঝায় কোনো বিষয় সম্পর্কে আমরা সম্ভব সব কিছু জানি, তাহলে উল্লিখিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কথা যা বলা হল তা সেই লক্ষ্য অর্জন করে না।

এভাবে বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতার ফল এবং সমস্যা-সমাধান প্রায়ই নতুন সমস্যা বলে মনে হয়, যদিও সমগ্র ফলাফল সন্তোষজনক হতে পারে। আমরা যখন প্রযুক্তির অগ্রগতি থেকে উদ্ভূত নতুন সব সামাজিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে চাই, তখন এই সম্ভাবনার কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৈরির প্রেক্ষাপটে আমাদের আরও একটি কথা স্মরণে রাখা আবশ্যক। মানুষ আজ হঠাৎ করেই এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বারে উপনীত, আর তা সম্ভব হয়েছে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমেই। আমাদের এই প্রজন্মের আমরা দেখছি মানবজাতি কী বিপুল শক্তির অধিকার অর্জন করেছে। পরমাণু বিভাজনের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রায় অফুরন্ত এক শক্তির উৎস আয়ত্তে এনেছে। কম্পিউটার বিজ্ঞান তা গণনা, বিশ্লেষণ, এমন কি ভবিষ্যদ্বাণীর ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি প্রায় সীমাহীন পর্যায়ে উন্নীত করেছে। আর বংশগতিবিদ্যার ক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশত আণবিক জীববিদ্যার প্রয়োগের বদৌলতে মানুষ তার জীবনের উপরও নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে শুরু করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যা জ্ঞান ব্যবহারের হাতিয়ার। এই পথেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ ধীরে ধীরে তার পরিবেশের উপর ক্রমশ প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। অন্যদিকে একই সঙ্গে তার মানসিক ও আত্মিক চিন্তার বিকাশ ঘটিয়েছে।

প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে যেমন বোঝায় জ্ঞানের ব্যবহার, তেমনি বিজ্ঞানের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার সম্পর্ক জ্ঞানের সাথে। অবশ্য এই শব্দ দুটি নিয়ে আমাদের মাঝে রয়েছে এক ধরনের অস্পষ্টতা। আর এই অস্পষ্টতা বোধ থেকেই আমরা বিজ্ঞানকে জীবন থেকে আলাদা ভাবি, বিজ্ঞানের ফসলটুকুই চাই, তার জ্ঞান-প্রক্রিয়ার পথকে পরিহার করতে ব্যস্ত।

শেষ বিশ্লেষণে—মানুষের উদ্ভব পদার্থ থেকে। সে তার পরিবেশ 'জানতে' ও 'বুঝতে' শুরু করেছে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণকারী বিপুল শক্তির রূপও। উপলব্ধি করতে

শুরু করেছে জীবনের প্রক্রিয়া। মানুষের মহৎ কীর্তি হল তার জ্ঞান। জ্ঞান মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করতে পারে, অন্যদিকে অজ্ঞতা তাকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখে, এবং বেঁধে রাখতে চায় কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের জালে। মৌলিক জ্ঞান অর্জনের পথে বিজ্ঞানের অগ্রগতি স্তব্ধ হওয়ার নয় এবং স্তব্ধ হওয়া উচিতও নয়।

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে। বিজ্ঞানের কি একক দার্শনিক ভিত আছে? বিজ্ঞান কি কোনো কিছু জানার জন্য অনন্য পথ অনুসরণ করে? বিজ্ঞান কি কোনো বিষয় সম্পর্কে পরিশুদ্ধ বা পরম জ্ঞান দান করতে পারে? বস্তুবাদী দার্শনিকেরা (যেমন ফ্রেডারিক হার্বার্ট) জ্ঞানের ভিত্তি সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেন তার সারাংশ হল : 'অভিজ্ঞতা' আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি, দর্শনের সব সমস্যার মীমাংসা সম্ভব আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য ও ঘটনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তবে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধির প্রয়োগে। শোপেনহাওয়ার মনে করতেন যে জ্ঞান মাত্রই প্রত্যক্ষমান। চেতনাপ্রসূত তথ্যাবলী হল আমাদের জ্ঞানের ভিত। এখন দেখা যাক বিজ্ঞান কি পদ্ধতিতে সত্যে উপনীত হতে বা জ্ঞান অর্জন করতে চায়।

প্রকৃত বিজ্ঞানে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার প্রধান উদ্দেশ্য সেই সব সাদৃশ্য নিয়ম, সাধারণ নীতি এবং মৌল নীতির সন্ধান করা যেগুলি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিজ্ঞানী দেখে জ্ঞান হচ্ছে অভিজ্ঞতা অর্থাৎ পরীক্ষালব্ধ চরিত্র। তাই প্রথমে অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ পরে সাধারণীকরণ প্রচেষ্টা এসব তথ্য বিশ্লেষণ বিচারবুদ্ধি ধ্যান আর হিসাবের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায় প্রকৃতির নিয়মাবলী। তৃতীয় পর্যায়ে যুক্তিবিদ্যার সহায়তায় বিজ্ঞান গড়ে তোলে বিশেষ নিয়মাবলী, যেগুলি পরীক্ষার সহায়তায় প্রমাণ করা সম্ভব। এরপর এই বিশেষ নিয়মাবলীর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বিভিন্ন প্রাকৃত ঘটনা এবং যুক্ত করা হয় বিশেষ নিয়মের সাথে সাধারণ নিয়ম। এ পদ্ধতি নিঃসন্দেহে আরোহী পদ্ধতি। ম্যাক্সওয়েল কর্তৃক তাড়িত চৌম্বক ক্ষেত্রের চারটি সমীকরণের প্রতিষ্ঠা—এই পদ্ধতির সুন্দরতম উদাহরণ। এর পাশাপাশি অবরোহী বা দার্শনিকদের খুব পছন্দ সেই পদ্ধতি ও বিজ্ঞানের সত্য আবিষ্কারে প্রযুক্ত হয়েছে সার্থকভাবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানকে প্রায়োগিক স্তর থেকে গাণিতিক যৌক্তিক স্তরে তুলে আনা সম্ভব, অভিজ্ঞতার দ্বারা লালিত বুদ্ধি ও মেধার প্রয়োগে। বিজ্ঞানী অভিজ্ঞতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই হোক অথবা নিজ প্রজ্ঞার দ্বারা চালিত হয়েই হোক বহির্জগতের সাথে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রভাবিত একটি গাণিতিক প্রতিকৃতি নির্মাণ করেন। এই গাণিতিক প্রতিকৃতিতে স্থান পায় অবরোহী পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা পরিশুদ্ধ কিছুর গাণিতিক প্রতীক ও পরিভাষ্য।

এই অবরোহী পথই অবলম্বন করেছিলেন নিউটন ও আইনস্টাইনের মতো প্রতিভাধরেরা। আপেক্ষিক তত্ত্ব বিশেষ করে সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্ব পদার্থ বিদ্যার অভিজ্ঞতায় নিষিক্ত হয়ে গাণিতিক প্রতিকৃতি থেকে বিকশিত হয়েছে। আইনস্টাইনের মতে—কোনো ভৌত ব্যবস্থার গড়ন পরীক্ষালব্ধ বা কোনো অভিজ্ঞতা প্রসূত উপাত্ত থেকে উদ্ভূত হয় না। এর মূল নীতিসমূহ হচ্ছে 'মানবীয় ধী শক্তির মুক্ত উদ্ভাবনা'। অভিজ্ঞতা হয়তো যুৎসই গাণিতিক ধারণাসমূহকে পেতে সাহায্য করে, কিন্তু ঐসব ধারণা কখনো

অভিজ্ঞতা থেকে আহরণ করা যায় না। সৃজনশীল নীতির অস্তিত্ব গণিতেই থাকে। বেকনীয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের মহৎ কিছু আবিষ্কৃত হয় না। প্রকৃতির মৌল নীতি ধরা দেয় না। এই ছিল আইনস্টাইনের বিশ্বাস। এই প্রক্রিয়ায় কেপলার, রিড্‌বার্গ সৃষ্ট হতে পারেন, কিন্তু বোর বা নিউটনের সৃষ্টি সম্ভব নয়। সহজ কথায় বিজ্ঞানের সংজ্ঞা হল আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশৃঙ্খল সংবেদনসমূহকে একটি যুক্তিনির্ভর ঐক্যবদ্ধ চিন্তাব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে নেবার প্রচেষ্টা। অভিজ্ঞতা বহির্লব্ধ, কিন্তু যে তত্ত্বের মাধ্যমে ওদের বুঝবার প্রয়াস তা মনুষ্যমেধায় উদ্ভাবিত। ভৌত ঘটনার প্রকাশ আর তার যৌক্তির ব্যাখ্যা দেবার মাধ্যমেই তত্ত্বের উদ্ভব বা বিকাশ ঘটে, পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠিত না হলে, ভবিষ্যতের দিক-নির্দেশনা না দিতে পারলে তত্ত্ব প্রশ্নাতীত হয় না। নতুন তত্ত্ব এসে পুরানো তত্ত্বকে অপসারণ করতে পারে। এই হল বিজ্ঞানের পথ, বিজ্ঞান কোনো বিষয় সম্পর্কে পরম জ্ঞান দেয় না। এই জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। এটিও বিজ্ঞানের আরেকটি অসম্ভবের নীতি। এর সাথে অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে—প্রয়োগধর্মিতা হল বিজ্ঞানের সব চাইতে বড় বিচার্য বিষয়। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে প্রযুক্তিবিদ্যা জ্ঞান ব্যবহারের হাতিয়ার। একথাও বলা প্রয়োজন, মৌলিক প্রাকৃতিক নিয়মগুলি যুক্তিবিন্যাস কিংবা গানিতিক হিসাবের সাহায্যে গড়ে তোলা যায় না। মৌলিক প্রাকৃতিক নিয়ম হল আমাদের জ্ঞানের নির্যাস। জ্ঞানের সাধারণকৃত রূপ। প্রাকৃতিক নিয়মকে আবিষ্কার করতে হয়, উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে আসতে হয়। এটি করেন বিজ্ঞানী—তিনি অবরোহী বা আরোহী যে পথই অবলম্বন করুন না কেন, চিন্তাধারার যে শৃঙ্খলা আর সৃজনশীল অনুভূতির সাহায্যে একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করেন তার আলোচনা অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক হবে সন্দেহ নেই।

আর একটি প্রশ্ন সতত উচ্চারিত হয়—বিজ্ঞানে কি সজ্ঞার (Intution) স্থান আছে। অনুপ্রাণিত অনুমান বা অনুধাবনকে যদি সজ্ঞা নামে ডাকা হয় তাহলে তা অবশ্যই আছে। কিন্তু এই অনুধাবনের পশ্চাতে থাকে অভিজ্ঞতার এক শক্তিশালী পটভূমি: বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক। মনুষ্য-মস্তিষ্ক বিকাশের এমন এক স্তরে এসেছে যে সামাজিক ও উপযোগ্য পটভূমি পেলে উদ্দীপ্ত অনুপ্রেরণা স্বতঃই জন্ম নিতে পারে। আইনস্টাইন কর্তৃক আলোর গতির অনপেক্ষতা, সমতূল্যতার নীতি; প্ল্যাঙ্ক কর্তৃক বিকিরণ স্পন্দকের শক্তি স্তরের কোয়ান্টায়নের ধারণা, দ্য-ব্রগলীর তরঙ্গ-অপেক্ষক ধারণা—এসবই অনুপ্রেরণা জাত বা সহজাত ধারণার উদাহরণ। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান উদ্ভাবনের পূর্বের সত্যেন বোস কর্তৃক কোয়ান্টাম কণিকার সংখ্যায়নিক আচরণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা বোসের অনুপ্রাণিত বা উদ্দীপ্ত অনুমিতির ফসল।

বিজ্ঞানে বিশেষ করে পদার্থবিদ্যার জ্ঞানতত্ত্বের আর একটি নীতি হল যথাসম্ভব কম সংখ্যক প্রাকৃতিক নিয়মের মাধ্যমে জগৎ-ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া। এই পথের অগ্রপথিক ছিলেন নিউটন, ম্যাক্সওয়েল, আইনস্টাইন, আর আমাদের কালে সালাম-ভাইনবার্গ-গ্লাশো, এবং হকিং ; বিশ্ব-ঘটনাকে জন্ম থেকে পরিণতি একটি একীভূত তত্ত্বে দাঁড় করানোর সাধনায় এঁরা ব্রতী।

দুই. যুক্তিহীন সমাজ

উপরের এই আলোচনা থেকে অবশ্য বলা যায় যে, বিজ্ঞানমনস্ক মুক্তচিন্তা সমন্বিত সমাজ গড়তে হলে জ্ঞানচর্চার পথ হবে যুক্তিভিত্তিক, অনুসন্ধিৎসু চেতনা-চিন্তানির্ভর। জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ব্যতিরেকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়, এর অভাব হলে সমাজ হয় পশ্চাদ্‌মুখী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ইবনে রুশদ বহু শতাব্দী আগে জ্ঞানচর্চার এই পথের প্রদর্শক ছিলেন। তিনি সম্ভবত ইসলাম জগতের প্রথম দার্শনিক যিনি মুক্তবুদ্ধি নিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কথা বলেছিলেন। তাঁর মতে দর্শন থেকেই কেবলমাত্র সত্যের আশা করা যায়। তাই তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানকে ধর্ম থেকে পৃথক করার প্রয়াস পান। অন্ধ ধর্মবিশ্বাস যে জ্ঞানচর্চার পথে অন্তরায় একথা বলতে তিনি দ্বিধা বোধ করেননি। কুসংস্কারে আবৃত ধর্মবোধ মানুষের স্বাধীনতা ও অগ্রগতির ধারাকে নস্যাৎ করে—এর ফলে শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, প্রয়োগ ও তত্ত্বীয়ভাবেও মানবজাতি শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। যুক্তির সামর্থ ও ক্ষমতাই হল মানুষের জীবনের নির্যাস। যুক্তির পরিচ্ছন্নতা মানুষকে মানুষে পরিণত করে; অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিকে যখন বেশি প্রাধান্য দেয় মানুষ তখনই হয় সত্যিকার অর্থে ধার্মিক। জনগণকে চিন্তা না করতে বলা এবং তাদেরকে বিশ্বাসী বানাবার অর্থ হল তাদেরকে পশুরও নিচের স্তরে নামিয়ে দেওয়া। ধর্মবাদীরা তাই যুক্তিকে ভয় পায়। কারণ যুক্তি-আশ্রয়ী চিন্তার প্রসারতা জ্ঞান অর্জনে সহায়ক। তখন মানুষ অলৌকিক, ঐশ্বরিক বা দৈব বলে কোনো ঘটনায় আর বিশ্বাস স্থাপন করতে চায় না, সব ঘটনার পেছনেই খুঁজে পায় কার্যকারণ সূত্র, খুঁজে পায় যুক্তিনির্ভর বিশ্লেষণ। এমনকি মার্টিন লুথারের মতো মানবতাবাদী মানুষও যুক্তিকে ভয় পেতেন, কারণ যুক্তিকে গ্রহণ করলে ঈশ্বরের অনেক অলৌকিক ক্রিয়াকর্মে আস্থা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। যেমন তিনি বলছেন :

'And what saith God? Impossible things, lies, foolish, weak, absurd, abominable, heretical, and devilish things, if we believe reason. So, if you follow the judgement of reason, God setteth forth absurd and impossible things when he setteth out unto us the articles of the Christian fatith'.

অথচ যে যুক্তিবাদী দার্শনিক দর্শনচর্চার মাধ্যমে জ্ঞান ও সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় নিরলস চেষ্টা করেছেন, যার জন্য গ্যালিলিওর বহু পূর্বে তাঁকে মুক্তবুদ্ধি চর্চার জন্য নির্যাতিত হতে হয়েছিল, নিজ বাসভূমি থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, বিচারের নামে প্রহসন সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে তৌবা করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাঁকেও ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। অথচ ইবনে রুশদ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন না। ধর্ম অনিরপেক্ষ মুক্তবুদ্ধি-আশ্রয়ী 'আরবীয় দর্শন' মোহাম্মদ আল ফারাবী ও ইবনে সিনার মতো মনীষীদের যত্নে ও চর্চায় বিকশিত হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে ইমাম গাজ্জালীর চিন্তা ও প্রভাবে তা আরব ও মুসলিম জগৎ থেকে প্রায় নির্বাসিত হয়। পরবর্তীকালে ইবনে রুশদ আবারও এই আঘাতপ্রাপ্ত আরবী দর্শনকে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। এর ফলে এই মনীষীদের যেমন ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ, ওমর খৈয়াম, আল-বেরুনী প্রমুখকে পলাতকের জীবনযাপন করতে হয়েছিল, তাঁরা কাফের নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

বস্তুত ইমাম গাজ্জালীল পর পরই ইসলাম জগৎ থেকে মুক্তবুদ্ধির চর্চার, মুক্ত দর্শন চর্চা, বিজ্ঞান-সাধনা নির্বাসিত হয়, যা থেকে ইসলাম জগৎ এখনও মুক্ত হতে পারেনি। ইসলাম জগতের আর একজন ধর্ম-অনপেক্ষ চিন্তাবিদ হলেন সে যুগের মানবতাবাদী দার্শনিক জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম। জ্যামিতি ও বীজগণিতের শাখাতেও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ লেগেছে, সেই ব্যক্তিটি ছিলেন মুক্তবুদ্ধির ধারক; তাঁর মাঝে প্রকাশ পেয়েছে যুক্তির উপর নির্ভরতা ও বিচক্ষণতা। একটি চমৎকার আরবী কবিতার মধ্য দিয়ে খৈয়াম-দর্শনের নির্যাস বিধৃত হয়েছে :

যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো
এপিকিউরাস, প্লেটো
অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হত,
যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো
গবেষণা প্রতিষ্ঠান হত,
যদি মানুষ ধার্মিকের ধর্মান্ধতার পরিবর্তে
নীতিজ্ঞানের চর্চা করত,
যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যা চর্চাকেন্দ্র
হিসেবে গড়ে উঠত,
ধর্মতত্ত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত-বীজ-
গণিতের উন্নতি সাধন করত,
যুক্তিবিদ্যা যদি সুফিতত্ত্ব, সংস্কার,
কুসংস্কারের জায়গা দখল করত,
ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা
মানবতার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হত,
পৃথিবী তাহলে বেহেশ্‌তে পরিণত হত,
পরপারের বেহেশ্‌ত বিদায় নিত,
প্রেম-প্রীতি-মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হত
নিঃসন্দেহে।

ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন মনে হয় বাংলাদেশ যেন তার প্রেক্ষাপটে বিরাজ করছিল। এতদিন পরেও বলতে ইচ্ছে করে ওমর তুমি আর একবার আস এই দেশে, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন।

তিন. আমাদের অবস্থান ও বিজ্ঞানে অগ্রযাত্রা

জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র গ্রন্থগুলো হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায়, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কূপমণ্ডুকতা আর অজ্ঞানতা। সে সমাজ হবে পশ্চাদ্‌মুখী। আমাদের সমাজে কি

দেখা যাচ্ছে: কুসংস্কার ও প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না; চাই তার ফসল; পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ। এই সমাজেই সম্ভব—ড্রইংরুমে রঙিন টেলিভিশন সেট স্থাপন এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসাকেন্দ্রে প্রেরণ। এ সমাজেই সম্ভব অনু-রসায়ণবিদের রসায়নচর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন। এই সমাজেই সম্ভব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী পণ্ডিত কর্তৃক লোকায়ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রে গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রণয়ন, আর একই সাথে আটরশীর পীরের দরগায় গিয়ে তাঁর চেয়ে অনেক কম শিক্ষিত ব্যক্তির কাছে আশীর্বাদ কামনায় ধর্না দেওয়া। আমাদের সমাজে এই চিত্র তো প্রায়শ দেখছি—তীক্ষ্ম মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা একদিকে পুরানো যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণাগুলিকে লালন করছে, অন্যদিকে অতি মনোযোগ দিয়ে ডাক্তারি বিদ্যা বা প্রকৌশলী শাস্ত্রে পাঠ নিচ্ছে, ভাল ফল করছে। এই দুই জীবনে সংঘাত নেই, নেই মিথস্ক্রিয়া। এ সমাজেই দেখতে পাই—কোনো মূল্যবান বস্তু হারানো গেলে পুলিশের সাহায্য না নিয়ে ছুটে যাই ফুঁ-পড়া মোল্লার কাছে। পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শ্রেণীকক্ষে মহাকর্ষ তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন, সেই অধ্যাপকই বিস্ময়ে স্বামীর পাদপদ্মে আছাড় খেয়ে পড়ছেন, যখন তিনি দেখেন যে তার গুরুদেব পৃথিবীর মহাকর্ষকে অস্বীকার করে শূন্যে ভাসছেন, অথবা শ্রবণ করেছেন ঐ গুরুদেব খড়ম পায়ে প্রমত্তা মেঘনা পাড়ি দিতে পারেন বিনা ক্লেশে। তাই অবাক হই না যখন দেখি রসায়নশাস্ত্রের তুখোড় অধ্যাপক প্যারাসাইকোলজির উপর উপন্যাস লিখে বিখ্যাত হন।

পরামনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানের নামে, গুরু ও অবতারবাদীরা এবং পীর নামে পরিচিতি কিছু ব্যক্তি ধর্মের নামে যথাক্রমে ধর্মতত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয়তাকে বিজ্ঞানসম্মত বা আধ্যাত্মিক বলে প্রচার করে চলছেন। পরামনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান-প্রদর্শিত পথ অনুসরণের নামে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা, প্লানচেট, জন্মান্তর, জাতিস্মর, টেলিপ্যাথি প্রভৃতির অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নানা ধরনের কূটকৌশল বা যাদুবিদ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন। অধিকাংশ অলৌকিক প্রতিভাধারী ব্যক্তি এ ধরনের কূট-কৌশলের সাহায্য নিয়ে তাঁদের অনুসারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু দুঃখজনক হলেও একশ্রেণীর শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী মানুষ নিজ স্বার্থের জন্যই হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক এইসব কার্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়তা দান করে থাকেন।

অথচ ইতিহাস শিক্ষা দিচ্ছে কুসংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামী বিজ্ঞানী চিন্তাবিদ্ জয়ী হয়েছেন সর্বকালে, পরম নির্যাতন হয়তো তাঁদের সইতে হয়েছে। শত অত্যাচার আর নির্যাতনেই ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ তাঁদের মতবাদ ত্যাগ করেননি। যিরহাম, আল দিমিস্কি মৃত্যুবরণ করেছেন; কিন্তু তাঁদের প্রগতিশীল যুক্তিবাদ বিসর্জন দেননি। ধর্মবিরোধী বলে নিন্দিত ও গোঁড়াপন্থীদের হাতে নিগৃহীত হয়েও মুক্তবুদ্ধির চিন্তা-চেতনা প্রচারণায় থেমে যাননি প্রখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী মোহাম্মদ বিন জাকারিয়া আল-রাজী।

সূর্য্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে পৃথিবীসহ সব গ্রহ—এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে ধারণ ও লালন করার জন্য ইতালীয় বিজ্ঞানী জিয়োর্দানো ব্রুনোকে সহ্য কতে হয়েছে দীর্ঘ আট

বছরের নির্যাতনমূলক কারাদণ্ড। ধর্মান্ধ মানুষ, ধর্মযাজকবৃন্দ আর জগদ্‌গুরু পোপ ক্ষিপ্ত হলেও ব্রুনো সত্যকে ত্যাগ করেননি। তারপর চরম দণ্ড হিসেবে ১৬০০ খৃস্টাব্দে পবিত্র গ্রন্থবিরোধী মতবাদ লালন করার জন্য তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হল। তবু সত্যই প্রতিষ্ঠিত হল। গ্যালিলিও গ্যালিলি-এর কাহিনী আমরা সবাই জানি, তবু পৃথিবী ঘুরছে পৃথিবীর চারপাশে। ঈশ্বর পুত্রের জন্মের প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে আনাক্সগোরাস চন্দ্রগ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, বলেছিলেন চাঁদের কোনো আলো নেই নিজের। পবিত্র গ্রন্থবিরোধী এই মতবাদ প্রচারের জন্য এই মহান বিজ্ঞানীকে দীর্ঘদিন নিষ্ঠুর নির্যাতন করে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। কিন্তু পবিত্র গ্রন্থের বাণী টেকেনি—প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক সত্যই—চন্দ্রগ্রহণ কোনো অতিপ্রাকৃত ঘটনা নয়। ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক প্যারাসেলসাস গবেষণার মাধ্যমে দেখলেন যে, রোগের পশ্চাতে রয়েছে শরীরের মধ্যে বাসাবাঁধা বিশেষ বিশেষ ধরনের রোগজীবাণু। পরজীবী এই জীবাণুদের ধ্বংস করলেই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রোগের পশ্চাতে রয়েছে পাপের ফল বা কোন অজ্ঞাত শক্তি—এটিই ছিল এককালে ধর্মবিশ্বাস। তিনি বিচারের সম্মুখীন হলেন ধর্মবিরোধী মত প্রচারের জন্য। মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অধ্যাপক পালিয়ে জীবন রক্ষা করলেন। সত্য আজ জয়ী।

ভৌতবিজ্ঞানের মতো জীববিজ্ঞান বা সৃষ্টিবিজ্ঞান গত শতকে উন্নতি করেনি। তাই সৃষ্টিরহস্য নিয়ে মোল্লা-পুরোহিতেরা পবিত্র গ্রন্থগুলিতে উল্লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের দোহাই দিয়ে প্রাকৃতজনের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করত। স্বর্গ-নরকের কথা তুলে সাধারণ মানুষকে করে তুলত আতঙ্কগ্রস্ত। কিন্তু জীববিজ্ঞানের সাম্প্রতিক কালের অভাবনীয় উন্নতিতে সৃষ্টি সম্পর্কে পবিত্র গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত তত্ত্বে বিশ্বাস রাখা সাধারণ মানুষের পক্ষেও ক্রমেই কষ্টকর হয়ে উঠছে।

সনাতন হিন্দুধর্ম বলে ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা—তাঁর অঙ্গ-প্রতঙ্গের অংশ থেকে জগতে তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করেছেন। মানুষও এক শ্রেণীর জীব। খৃস্ট ধর্মমতে সকল প্রকারের জীবের স্রষ্টা হলেন পরম পিতা জিহোবা। তিনি জোড়ায় জোড়ায় বিভিন্ন শ্রেণীর জীব সৃষ্টি করেন পৃথিবীতে। এমনি করেই জিহোবা একদা সৃষ্টি করলেন প্রথম মানব-মানবী দম্পতি। আদম ও ঈভ। আমরা সবাই সেই আদি মানব-মানবী আদম আর ঈভের সন্তান-সন্ততি।

কিন্তু জীববিজ্ঞানের ও সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণা ধর্মগ্রন্থ-উল্লিখিত সৃষ্টি সম্পর্কিত তত্ত্বের উপর বিশ্বাসকে শিথিল করে তুলছে। একথাই বরং প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ক্রমেই যে, কোনো জীবই পরম-পিতা ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হয়ে হঠাৎ করে পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়নি। পৃথিবীতে জীবনের উন্মেষ ঘটেছে কোটি কোটি বছর ধরে দীর্ঘ ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে। এই প্রক্রিয়ারই সার্থক পরিণতি পৃথিবীতে বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের আবির্ভাব।

প্রাণীদের ক্রমবিবর্তনের বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস প্রথম তুলে ধরেছিলেন ডারউইন। দীর্ঘ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হল 'The Origin of Species.' যার মধ্যে তিনি বিবর্তনের তত্ত্ব ও চীন সৃষ্টিতত্ত্বকে, মানুষ সৃষ্টির কল্পকাহিনীগুলির ভিত্তিকে নড়বড়ে করে

দিলেন। আধুনিক কালের নানা প্রকারের জীবাশ্ম আবিষ্কার, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ ও প্রাচীনত্ব নির্ণয়কালের মধ্য দিয়ে জীবাশ্মবিজ্ঞানী, প্রত্নজীববিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীদের সমন্বিত চেষ্টা ডারউইনের হারানো লিংক সমূহকে জোড়া দেওয়ার কাজটি প্রায় সম্পূর্ণ করেছেন। একমাত্র রক্ষণশীল ধর্মান্ধ ব্যক্তি ছাড়া যে কোনো মুক্তচিন্তার অধিকারী নির্মোহ মানুষ বিশ্বাস করেন বিবর্তনবাদে আর মানুষের আবির্ভাব এই বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই। ডারউইনও তাঁর তত্ত্ব প্রচারের জন্য সমসাময়িক জ্ঞানপাপীদের কাছে সমালোচিত, ধিকৃত হন আর ধর্মান্ধদের হাতে তাঁকে নিপীড়িত হতে হয়েছে প্রায় মধ্যযুগীয় প্রথায়। বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য তাঁকে হজম করতে হয়েছে নানা জনের কাছ থেকে—যেমন বিশপ উইলবার বিদ্রুপভরে কটূক্তি করেছিলেন—ডারউইনের পিতামহ কি বানর ছিলেন। অনেকে বলতেন ডারউইন স্বয়ং ছিলেন দেখতে বানরের মতো, তাই তিনি বলেন মানুষ বানর থেকে জাত হয়েছে। ভাবতে বিস্ময় লাগে ডারউইন বা প্রত্নজীববিজ্ঞানী যাঁরা বিবর্তন তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠার জন্য গবেষণা করেছেন, অক্লান্ত চেষ্টায় সংগৃহীত তথ্যাবলীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন নিরুত্তাপ চিত্তে তাঁদের জ্ঞানের নখের যোগ্য না হয়েও, কোনো গবেষনা না করেও, কোনো জীবাশ্ম না দেখেও, কেবলমাত্র পবিত্র গ্রন্থের সাক্ষ্য মেনে বাংলাদেশী কোনো কবি গত কয়েক বছর আগে টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বিবর্তনবাদকে চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহস দেখান। কুসংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজে সবই সম্ভব।

আমরা এখন জানি ডারউইনের আগে মহাকবি গ্যেটে বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের মাথার খুলি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিবর্তনবাদের কথা বলেছিলেন। ডারউইনের বহুকাল আগে ভূতত্ত্ববিদ বাফুন তাঁর 'Natural History' পুস্তকে এই মতবাদ প্রকাশ করেছিলেন যে, বর্তমান কালের মহাদেশ, পর্বতমালা, উপত্যকা প্রভৃতি এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে এবং নতুন কিছু সৃষ্টি হবে। অপর একজন ভূতত্ত্ববিদ হিউটন তাঁর 'Theory of Earth' গ্রন্থে গুগমিলার তাঁর 'Testimony of Rocks' গ্রন্থে উভয়েই বাফুনের মতকে সমর্থন দেন দৃঢ়ভাবে। কিন্তু ধর্মপ্রবক্তাদের কাছে বিজ্ঞান বড় নয়, বড় হল পবিত্র গ্রন্থে উদ্ধৃত মত। তাই প্যারিসের ধর্মতত্ত্ব ফ্যাকাল্টি বাফুনের মতবাদকে গির্জা ও ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে 'ফতোয়া' জারি করে, আর বাফুন চার্চের সাথে বিবাদে না গিয়ে প্রাণ রক্ষায় নিজের মতবাদকে তুলে নিয়ে পবিত্র গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তা বিরোধী এ ধরনের ফতোয়াবাজদের উত্তরসূরিরা আজও প্রবলভাবে উপস্থিত।

আধুনিক প্রত্নজীববিজ্ঞানী ও জীবাশ্মবিদদের মতে পৃথিবীতে জীবনের প্রথম বিকাশ ঘটেছিল প্রায় সাড়ে তিনশত কোটি বছর আগে। অর্থাৎ পৃথিবীর জন্মের একশ কোটি বছর পরে। এই আদি জীব ছিল এক কোষ বিশিষ্ট জীবাণুসম প্রাণী, এদের বলা হয় প্রোকারিয়টস্ (Prokaryots)-অনেকটা আধুনিক ব্যাকটেরিয়ার মতো। এই এক কোষবিশিষ্ট প্রাণী থেকেই ধীরে ধীরে জাত হল বহুকোষ বিশিষ্ট প্রাণী বিবর্তনের পথ ধরে। দীর্ঘ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আধুনিক প্রতিটি শ্রেণীর প্রাণী এবং মানুষও এর বাইরে নয়। প্রাণী বা জীবনের সৃষ্টির পশ্চাতে ছিল বারটি উপাদান: এক ধরনের প্রোটিন অর্থাৎ নিউক্লিয়টাইড (Nucleotide), নিউক্লিক এসিড (Nucleic acid),

বিশেষ তাপমাত্রা এবং বিশেষ পরিবেশগত চাপ। এই চার উপাদানের মিলনে একদিন কোনো এক মাহেন্দ্রক্ষণে উন্মেষ ঘটেছিল প্রথম প্রাণের, অর্থাৎ অজৈব পদার্থ থেকে চৈতন্যময় জৈব পদার্থে। যার নাম জীবন। ঘটল উল্লম্ফন। কিন্তু এই জানার মধ্যে জীববিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা থেমে থাকেনি। বংশগত বিদ্যাচর্চার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানীরা জানতে পেরেছেন জীবনের রহস্য, তাকে নিয়ন্ত্রণের, পরিবর্তনের চাবি এখন মানুষের হাতে। মানুষ এখন জীবদেহে জিনসংক্রান্ত কর্মসূচির রহস্য উন্মোচন ও পরিবর্তন ঘটানোর অপরিসীম ক্ষমতা অর্জন করেছে, যে কর্মসূচি বস্তুত জীবন সৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের ভাবতে অবাক লাগে যে, পৃথিবীর সব ধরনের জীবনই অত্যাশ্চর্যভাবে সীমিত কতিপয় রাসায়নিক উপাদানের সংকেত ও কর্মসূচির উপর নির্ভরশীল। এই চার উপাদানের সাধারণ নাম : নিউক্লিয়োটাইড, এডেলিন, থাইমিন, সাইটেসিন ও গুয়ানিন (A.T.C.G)। এই চারটি প্রতীকী অক্ষরকে বলা হয় জীবনের বর্ণমালা। কি আশ্চর্য মাত্র এই চারটি অক্ষরের বিন্যাসক্রমের উপর নির্ভর করেই একটি গোলাপ ঝোপ বা একটি ভূট্টা গাছের সাথে একটি জীবাণু, হাতি বা মানুষের পার্থক্য সূচিত হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানবদেহের জিনগত কর্মসূচি এই চারটি উপাদানের ৩০০ কোটির সমন্বয়ে গঠিত, যা দেহের লক্ষকোটি কোষের অভ্যন্তরে কুণ্ডলী পাকিয়ে অবস্থানরত বিশাল এক অণুর রূপ নিয়েছে।

জীববিজ্ঞানীরা নিরূপণ করেছেন যে, আণবিক জীববিদ্যার সঙ্গতি থাকলে এই বিপুল বিষয় পাঠের ফল হিসাবে হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত এক একটি খণ্ডের মতো এক হাজার খণ্ড রচনা সম্ভব হত—যার প্রতিটি অক্ষর হল সেই জিন যার সংকেতের উপর নির্ভর করে জীবদেহের মৌল উপাদানগুলো বিন্যস্ত হয়ে থাকে। অতিসংবেদী রাসায়নিক যন্ত্রপাতির সহায়তায়—এই দীর্ঘদেহ কুণ্ডলীর দৈর্ঘ্য বরাবর সজ্জিত নির্দেশকগুলো সনাক্ত করা যেতে পারে। এগুলোকে মাইল ফলকের সাথে তুলনা করা চলে এবং এদের মধ্যে বিভিন্ন রোগের জিনের অবস্থান নির্ধারণ সম্ভব। এভাবেই নির্ণয় করা সম্ভব যে, কোনো ব্যক্তি ত্রুটিপূর্ণ জিন বহন করছে কিনা অথবা কোনো শিশু, প্রতিবন্ধকতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করছে কিনা, যাতে করে সেসব ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। একই পদ্ধতি জটিলতর রোগ যেমন হৃদযন্ত্র বা রক্তপ্রবাহ, উচ্চ রক্তচাপ, বহুমূত্র এমনকি ক্যান্সারের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে আগামী দিনের চিকিৎসা বিজ্ঞান হবে ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞান। তখন রোগ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী অধিকতর সুনিশ্চিত হবে, আর তাই রোগ নিরাময় অপেক্ষা রোগ-প্রতিরোধ সহজতর হবে। এমনকি বৃদ্ধকাল পর্যন্ত পূর্ণ ধীশক্তি ও কর্মক্ষমতা অক্ষুণ্ন রেখে দীর্ঘ জীবন অর্জনও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অসম্ভব নাও হতে পারে। একটি বিষয়ে অবশ্য আমাদের সতর্ক থাকা বিশেষ প্রয়োজন—জীববিজ্ঞানের এই অফুরান সম্ভাবনাময় প্রয়োগের ক্ষণে জিনতত্ত্ববিদের এই অসীম শক্তি অর্জনের ফলে আমাদের এক ধরনের শঙ্কাও জাগে। অধিক ফলনের উদ্দেশ্যে একটি বৃক্ষ বা একটি প্রাণীর নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে পরিবর্তন সংঘটনের সফলতায় জীনবিজ্ঞানীরা প্রশংসিত হয়ে থাকেন, কিন্তু একই সাথে মানুষের মনে ভয় লেগেছে যে, হয়তো এই পদ্ধতির প্রয়োগ একদিন মানুষের ক্ষেত্রেও সম্ভব হতে পারে। পঞ্চাশের দশকে

পদার্থবিজ্ঞানীরা যে নৈতিক সঙ্কটে পড়েছিলেন জিনবিজ্ঞানীরা আজ নতুন করে সে সঙ্কটে পড়েছেন—কোথায় টানবেন গবেষণার সীমারেখা। ফলাফলের দিকে তোয়াক্কা না রেখেই তাদের কি গবেষণা চালান ঠিক হবে, অথবা একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা তারা নিজেরাই বেঁধে নেবেন যা লঙ্ঘন করা হবে নিষিদ্ধ নৈতিকভাবে। অবশ্য জ্ঞানার্জনের কোনো সীমানা থাকতে পারে না, পারা উচিত নয়—এমনকি মানুষের জীনগত বংশগতির জ্ঞান সম্পর্কেও; তবে একথা ঠিক মানব বংশগতির পরিবর্তনের যে কোনো প্রয়াস নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। জিন প্রকৌশলীদের অবশ্য নৈতিকতার সীমায় ও তাদের কর্মতৎপরতার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ অবশ্য প্রযোজ্য। আমাদের অবশ্য একটি বিভেদ রেখা টানা উচিত হবে। কোনো রোগের নিরাময় বা প্রতিষেধকের জন্য রোগীর দেহে সুস্থ জীন স্থাপন কাঙ্ক্ষিত বিষয়; কিন্তু এ কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত প্রকৌশলীকে দায়িত্ববান হতে হবে, তাঁকে সুনিশ্চিত হতে হবে যে, প্রজনন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীর কোনো কোষে যেন জীন স্থাপন না করা হয়। অন্যদিকে প্রজনন কোষে বা নব্য ভ্রূণে জিন প্রতিস্থাপন গর্হিত কাজ, কারণ এর ফলাফল বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে এবং মানব-জীবনের উত্তরাধিকারগত চরিত্রে পরিবর্তন ঘটবে।

মানুষের জিনগত উত্তরাধিকার এমন এক সম্পদ যা সমগ্র বিশ্বমানবতার বিদ্যমান এখতিয়ারভূক্ত। এ নিয়ে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া বা একে পরিবর্তিত করা অনুচিত ও নীতি বিগর্হিত। এখানে কোনো হস্তক্ষেপ বিদ্যমান সামঞ্জস্য, সঙ্গতি ও ভারসাম্যের চমকপ্রদ রূপ নষ্ট করে দেবে। বিবর্তনের মধ্যমণি—এই মানব প্রজাতির সংরক্ষণে শুধু বিজ্ঞানী নয়, সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদেরও যৌথ দায়িত্ব রয়েছে। আর আমাদের সকলকে এই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে আতোঁয়া দ্য সেন্ট একসুপেরির মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে: 'মানুষ বাস্তবিক একটি সত্য ভুলে গছে। কিন্তু তুমি—তুমি কখনো তা ভুলো না। তুমি যা আয়ত্তে এনেছ তার দায় সর্বদাই তোমার।'

মানুষ বিজ্ঞানচর্চার দৌলতে এক অনন্ত সম্ভাবনার দ্বারে এসে পৌঁছেছে—একদিকে জড়-জগতের বিশ্বচিত্র অজানা নয়—এই বিশ্ব একদিন সৃষ্ট হয়েছিল, সৃষ্ট হয়েছিল সময়ের ইতিহাস-এ বিপুল মহৎ জগতে সুকঠিন নিশ্চয়তা আপেক্ষিক তত্ত্বের নিয়ম, অন্যদিকে কণাজগতের রহস্যময়তায় আজ মানুষের কাছে ধরা পড়েছে—এ জগতে রয়েছে অনিশ্চয়তার আশ্চর্যময় উপস্থিতি—কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নিয়ম। জীববিজ্ঞান উন্মোচন করেছে সৃষ্টির রহস্য, বংশগতির পুরুষানুক্রমিক ধারাবাহিকতার নিয়ম ও রহস্য। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই মনুষ্যজাতির অঙ্গ হয়েও আমাদের কূপমণ্ডুক সমাজ অন্ধ, যে সমাজে মুক্তবুদ্ধির চর্চা পদে পদে বিঘ্নিত। যে সমাজ তসলিমা নাসরিনের মতো সাধারণ অথচ সাহসী রমণীর বক্তব্যে- লেখায় ভীত, তার বিচার চায়, বিচার চায় মানবতাবাদী কবীর চৌধুরীর, আমাদের কালের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমানের, বেগম রোকেয়ার পর নারীমুক্তির প্রধান শক্তি সেই মাতৃসমা বেগম সুফিয়া কামালকে নিবারণ করতে চায় তাঁর কর্মতৎপরতা থেকে, তারা বোমা নিক্ষেপ করে ভয় দেখাতে চায় ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চকণ্ঠ চিন্তাবিদ আহমদ শরীফকে। বিজ্ঞান-অবিশ্বাসী মোহান্ধ সমাজে এই ঘটে।

পবিত্র গ্রন্থসমূহের উপকারিতা ও মানব সমাজে তার অবদান কেউ অস্বীকার করে না—কিন্তু ঐসব গ্রন্থে বিধৃত তথ্য ও সত্যই শেষ সত্য এবং জ্ঞানের পরম উৎস—একথা মেনে নিলে জ্ঞানচর্চার পথ অবরুদ্ধ হয়, সৃষ্টিশীলতার বিনাশ ঘটে। জ্যোতিষ্ক পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহা তাঁর চমকপ্রদ তাপ আয়নায়ন তত্ত্ব আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন—সেই সময় তাঁর দেশবাসী জনৈক প্রাচীন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি কৌতূহলী হয়ে সাহাকে তাঁর আবিষ্কারের কথা জানতে চেয়েছিলেন। সাহা পরম উৎসাহে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর তত্ত্বের মর্মকথা ও সুদূর প্রসারী তাৎপর্যের কথা। সব শুনে পণ্ডিতপ্রবর মন্তব্য করেছিলেন—'এ আর নতুন কি, এসব তথ্য তো বেদেই আছে।' আমাদের দেশেও কি এ ধরনের পণ্ডিতের কমতি আছে? একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী তো অহরহ আবিষ্কার করছেন যে বিজ্ঞান ও দর্শন অনেক পরিশ্রমলব্ধ জ্ঞানচর্চা ও ঘটনার মধ্য দিয়ে অর্জন করেছেন তার, সবই নাকি পবিত্র গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব আমাদের জ্ঞানচর্চার কি প্রয়োজন আছে—এটিই তো স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত। আমাদের কাজ কেবল কোনটি ধর্মসিদ্ধ আর কোনটি ধর্মসিদ্ধ নয় সে সম্পর্কে ফতোয়া দেওয়া।

আমাদের উপমহাদেশে সংস্কারে আচ্ছন্ন সমাজকে, মোহান্ধ মানুষকে কূপমণ্ডূকতার কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে বিজ্ঞানের আলোতে আনার জন্য যখন মুক্তবুদ্ধির চেতনায় প্রদীপ্ত বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদীর সবচাইতে বেশি প্রয়োজন তখন উল্লিখিত শ্রেণীর পণ্ডিত প্রবরগণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন, তারা প্রগতির চক্রকে উল্টোদিকে ঘোরাতে ব্যস্ত। শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিগ্রীধারী সংস্কারবদ্ধ মানুষ অলৌকিকবাদের কৌশলকে ব্যাখ্যা করতে না পারা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এইসব আত্মগর্বী বুদ্ধিজীবী ও বিজ্ঞানী, কৌশলকে আশ্রয় করে অতীন্দ্রিয়তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া বিজ্ঞানে শিক্ষিত এইসব মানুষই আমাদের সমাজে যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ ও মানুষ গড়ার কাজে সবচেয়ে বড় বাধা।

ড অজয় রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং সক্রিয় মানবাধিকার কর্মী।
লেখাটি আরজ আলী মাতুব্বর স্মারক গ্রন্থে (২০০১) এ প্রকাশিত।